একক ৪ ❐ মনসামঙ্গাল

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ কেতকাদাসের মঙ্গালকাব্য

৪.২.১ মনসামঙ্গাল কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনি-কাঠামো

৪.৩ চাঁদ বৃত্তান্ত

৪.৩.১ চাঁদ কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

৪.৪ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা

৪.৪.১ বেহুলা কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

৪.৫ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যমূল্য

৪.৫.১ মনসামঙ্গাল কাব্যের সাহিত্যমূল্য

৪.৬ ইতিহাসের উপাদান

৪.৬.১ মনসামঙ্গাল কাব্যে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

মঙ্গালকাব্য পাঠের উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মঙ্গালকাব্যের সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। সাধারণভাবে মঙ্গালকাব্য বলতে আমরা গার্হস্থ্য মঙ্গালের জন্য শ্রুত বা পঠিত আখ্যানকাব্যকে বুঝি। বস্তুতপক্ষে অনেক সময়েই এক মঙ্গালবারে এই কাব্যগুলির পাঠ শুরু হয়ে আরেক মঙ্গালবার পর্যন্ত চলত, মঙ্গালাসুর বধের কাহিনিও কোনো কোনো কাব্যে দেখা যেত। তবে মঙ্গালকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে এর ভাবগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হবে—এই দুই বৈশিষ্ট্য অবশ্য পরিপূরক।

ভাবগত দিক দিয়ে মনসামঙ্গাল বা যে-কোনো মঙ্গালকাব্যই কোনো দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার অর্থাৎ বিজয় কাহিনিমূলক। আসলে এই কাহিনির মাধ্যমে ওই দেবতা বা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হচ্ছে। আবার মঙ্গালকাব্যের মধ্যে একাধিক কাহিনি মিশে থাকে। এদিক থেকে মনে হতে পারে যে অনেক ব্রতকথার সমন্বয়ে যেন মঙ্গালকাব্য গঠিত। তবে মঙ্গাকাব্য গঠনগত দিক দিয়ে ব্রতকথার থেকে ভিন্ন—ব্রতকথার থেকে বিস্তৃতকর এই কাহিনিগুলি গড়ে তোলা হয় অনেকটাই সংস্কৃত পুরাণের আদলে। সেজন্য অনেকেই মঙ্গালকাব্যকে বাংলার পুরাণ বলেছেন। এই মঙ্গালকাব্যের কাহিনি-বিন্যাস রীতিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে সাজাতে পারি :

সৃষ্টিপালা ⟶ দেবতার জন্ম ⟶ দেব অভিশাপে স্বর্গবাসীর পৃথিবীতে আগমন ⟶ স্বর্গভ্রষ্ট-ব্যক্তির আনুকূল্যে কিংবা প্রাথমিক-প্রতিকূলতা পরবর্তী আনুকূল্যে দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার ⟶ স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিদের

পূজা প্রচারান্তে স্বর্গলাভ' এই কাহিনি-কাঠামোই প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে আরও কতগুলি বিষয় যুক্ত থাকে। যেমন সৃষ্টিপালার পরেই সচরাচর মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁর আত্মপরিচয় দেন এবং তিনি দেবতা বা দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা করছেন একথা জানাতে ভোলেন না। এই অংশটিকে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বলা চলে। এছাড়া প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই প্রায় বারোমাস্যা, সতীগণের পতিনিন্দা, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি অংশ থাকে। মঙ্গলকাব্যটির যে অংশ স্বর্গভূমিতে আধারিত সেই অংশটিকে আমরা দেবখণ্ড বলি আর যে অংশের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে তাকে আমরা নরখণ্ড বলি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের ধারায় মঙ্গলকাব্যই ছিল অন্যতম প্রধান কাব্যরূপ। জনপ্রিয়তা ও প্রচারের নিরিখে আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিকে মুখ্য ও গৌণ—দুভাগে ভাগ করতে পারি।

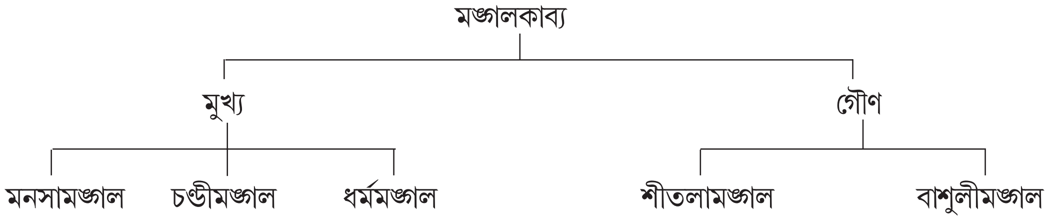

ইচ্ছে করেই আমরা এই তালিকায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে রাখলাম না। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গালে নানাভাবে মঙ্গালকাব্যের কাহিনিগত অভিপ্রায়কে ভাঙতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'বাংলার মঙ্গালকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়।' রবীন্দ্রনাথ দেবতা বা দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে এইভাবেই বিশ্লেষণ করেছিলেন। আমরা বলব মঙ্গালকাব্যগুলি আসলে বিজিত বঙ্গাভাষীদের ইচ্ছাপূরণের কাব্য। সামাজিক দিক দিয়ে তাঁরা যখন ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে জর্জরিত তখন সামূহিক অভিপ্রায় থেকে (সচেতন বা অবচেতন অভিপ্রায়) শক্তিদেবী বা দেবতার কাহিনি কাব্যাকারে বিন্যস্ত করা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে কাহিনির শক্তিদেবী যেন সমস্যার মোচন করবে।

সুতরাং মঙ্গালকাব্যের এই গঠনগত বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখলে, বঙ্গাভাষীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত বোঝার জন্য এবং নানা চরিত্রের মধ্যে বঙ্গাভাষীর মনোভঙ্গির কোন্ রূপ ধরা পড়েছে তা দেখার জন্যই মঙ্গালকাব্য পাঠ করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে মঙ্গালকাব্যগুলি যেহেতু নানা মৌখিক কাহিনির ধারক সেহেতু এর মধ্যে লোকসাহিত্যের নানা উপাদানও মিশে আছে।

৪.১ প্রস্তাবনা

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে যে কথাগুলি লিখেছিলেন মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ বোঝার জন্য সেই কথাগুলি জরুরি। সূত্রাকারে রবীন্দ্র-লিখন সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে—

ক. 'একটি সমগ্র দেশ, সমগ্রযুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে' মহাকাব্যের মধ্যে প্রকাশ করতে চায়।

খ. মনে হয় মহাকাব্যটি 'যেন...বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।'

মহাকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক উভমুখী প্রতিন্যাস কাজ করে যাচ্ছে। মহাকাব্য একটি সমগ্র দেশের সমগ্র যুগের অভিজ্ঞতাকে যেমন প্রকাশ করে তেমনই মহাকাব্যের মধ্য থেকেই সেই দেশ পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণরস সংগ্রহ করে। অর্থাৎ এক জাতিগোষ্ঠীর চেতনাকে অবলম্বন করে যার সৃষ্টি সেই মহাকাব্যই সেই জাতিগোষ্ঠীর পরবর্তী চেতনার নির্ণায়ক বা মূল্যায়ক।

মনসামঙ্গাল কাহিনির মধ্যেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। মনে রাখতে হবে বাঙালি মিশ্রসত্ত্ব জাতি। সুতরাং বঙ্গাভাষীর জীবন-চেতনার বৃত্তান্ত কোনো রচনার মধ্যে বিধৃত থাকলে সেই রচনার আদত উপাদানের মধ্যেও এক রকমের মিশ্রতা বর্তমান থাকবে। উপাদানগুলির মধ্যে থাকবে মিল ও অমিলের দ্বিধা। অবশ্য সেই দ্বিধা এতটা প্রকট হবে না যাতে সমস্ত রূপটি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঙ্গালকাব্যের কাহিনি লক্ষ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে কাহিনিবৃত্ত গড়ে ওঠার কাল, কাহিনি বিস্তারের কাল ও কাহিনি পুনর্কথনের কাল নানাভাবে মিশে আছে। কাহিনি রচনার সময় এই নানা কাল তার মধ্যে সমাহৃত। আবার রচয়িতা ও অঞ্চলভেদে মনসামঙ্গালের কাহিনির নানা ভেদ আছে। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, জগৎজীবন ঘোষাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল, দ্বিজ বংশীদাস প্রমুখের রচনায় নানা ভেদবিভেদ লক্ষ করা যায়। কোনো আদর্শ পাঠক এই ভেদের মধ্যে একটা সামগ্রিকতা খোঁজার চেষ্টা করবেন। বিষয়টি একটি রেখাচিত্রে মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে।

	মৌখিক কথাবস্তু	১	৪	
ক.	⟶	মনসামঙ্গাল লেখরূপ (পূর্ববঙ্গা)		
	মৌখিক কথাবস্তু	২		
খ.	⟶	মনসামঙ্গাল লেখরূপ (রাঢ়বঙ্গা)	মনে মনে কল্পিত সমস্ত ভেদসমন্বিত বঙ্গাভূমির মঙ্গালকাব্য	* পাঠক
	মৌখিক কথাবস্তু	৩		
গ.	⟶	মনসামঙ্গাল লেখারূপ (উত্তরবঙ্গা)		

চিত্রটিতে ক, খ, গ হচ্ছে মৌখিক কথাবস্তু। এই কথাবস্তুগুলি যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ এই মনসামঙ্গাল কাহিনিধারার মধ্যে লেখরূপ লাভ করছে। আমরা ধরে নিলাম, ১, ২, ৩ হল যথাক্রমে পূর্ববঙ্গা, রাঢ়বঙ্গা ও উত্তরবঙ্গোর মনসামঙ্গাল। এই তিনধারার মনসামঙ্গালের মধ্যে সাধারণ উপাদান যেমন আছে তেমন আছে বিশিষ্ট উপাদান। এই বিশিষ্ট পৃথক উপাদানগুলি প্রমাণ করছে মনসামঙ্গালের মধ্যে বিভিন্ন সমাজবাস্তব-জাত কাহিনিধারা মিশেছে। পাঠক এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পাশাপাশি রেখে মনে মনে গড়ে নিতে পারেন নিজস্ব এক মঙ্গালকাব্য। ৪ হল সেই স্বনির্মিত মঙ্গালকাব্য।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বাইশ কবির মনসামঙ্গাল বা বাইশা।' এই বইটির ভূমিকায় আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গালের পদসঙ্কলনকে 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গাল' বলিত। বর্তমান সঙ্কলনখানিও প্রধানত

এই আদর্শেই সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাও কবির মনসামঙ্গাল বা বাইশা বলিয়া উল্লেখ করা গেল। তবে ইহার সঙ্গো মধ্যযুগের বাইশাগুলির একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে—মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক সঙ্কলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত না—বর্তমান সংগ্রহখানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইয়াছে।' অর্থাৎ আশুতোষ ভট্টাচার্যও সমস্ত মঙ্গালকাব্যের নানা ভেদ থেকে বঙ্গাভাষীর প্রবণতার সামগ্রিক একটি দিক অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন।

মধ্যযুগে শুধু মনসামঙ্গাল নয় অন্যান্য অজস্ব মঙ্গালকাব্য লেখা হয়েছিল। সেই আখ্যানকাব্যগুলির মধ্যেও বঙ্গাভাষীদের নানা চিন্তা চেতনা মিশে থাকা সম্ভব। তবে মনসামঙ্গালকাররা যতটা অনায়াসে অন্যান্য আখ্যানের উপাদান ও প্রকাশভঙ্গি গ্রহণ করেছেন অন্যরা তা করেননি। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেছিলেন মনসামঙ্গাল ধারায় প্রথম শ্রেণির বিষয়বস্তু নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। মুকুন্দের কাব্যের কথা স্মরণে রেখেই এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন দীনেশচন্দ্র। অবশ্য এই মন্তব্যের অন্য তাৎপর্যও আছে। মনসামঙ্গালকারাদের একক প্রতিভার দ্যুতি ততটা ছিল না বলেই তার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান সহজে মিশে যেতে পেরেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের বাইশা থেকে কয়েকটি অংশ নিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

বেহুলার অষ্টমাসী (ষষ্ঠীবর) } সপ্তদশ শতক
মনসার বারমাসী (ষষ্ঠীবর)

অষ্টমাসী ও বারামাসী এই উপাদান দুটি মঙ্গালকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও আমরা বিশিষ্টার্থে ফুল্লরার বারোমাস্যা (মুকুন্দ) স্মরণে রাখি। মনসামঙ্গাল রচয়িতাদের মধ্যে ষষ্ঠীবর বারোমাসী ও অষ্টমাসী ব্যবহার করেছেন। মুকুন্দের মতো বিশিষ্ট্য তিনি নন আবার উপাদানটিকে রচনাতে সমাহৃত করতে পারেন। এই উপাদানের সমীকৃতির সূত্রেই আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়—

১) বিজয় গুপ্তের মনসার বনবাস—বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, 'কান্দে দেব মহেশ্বর / তুমি কন্যা একেশ্বর / কিরূপে বঞ্চিব বনবাস।' আমাদের রামায়ণ কাহিনির কথা মনে পড়বে। সেখানে রামের বনবাসের ক্ষেত্রে কৈকেয়ীর ভূমিকা ছিল, এখানে বিমাতা চণ্ডীর ভূমিকা রয়েছে।

২) নারায়ণ দেবের বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা—নারায়ণ দেব রামায়ণের সীতাকাহিনির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বর্গ থেকে ফিরে আসায় বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সীতাকেও রাবণ রাজার কাছ থেকে মুক্তির পর অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়।

৩) নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলা লখীন্দরের যোগীবেশ ধারণ—নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে লিখেছেন : 'গোর্ঘ বলি দুই যোগী মারিল হুঙ্কার।/কপাট হুড়কা চাবি ভাঙ্গিালেক দুয়ার॥ / দুই যোগী প্রবেশিল বাড়ির ভিতরে।/সত্য গোরক্ষ বোলি যোগী শৃঙ্গানাদ করে।।/ব্রহ্মজ্ঞান সুমরিয়া যে বসিল ভূমিত/যোগী বোলে সুখে থাক চন্দ্রআদিত।' এখানে নারায়ণ দেব নাথ সাহিত্যের যোগীমাহাত্ম্যকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এভাবেই মনসামঙ্গাল কাব্য ধারায় বঙ্গাভূমির সাহিত্যধারার নানা অংশ মিশে যায়। চণ্ডীমঙ্গালের মতো ব্যক্তিকবির প্রাধান্য নেই বলে ব্যক্তিগত বিন্যাসের কারুকৃতির বদলে বিষয়ের বৈচিত্র্যই মুখ্য হয়ে ওঠে।

বঙ্গাভূমিতে এক দীর্ঘ কালপর্ব ধরে মনসামঙ্গাল কাহিনি লেখা হয়েছে। কানা হরিদত্তের পুঁথি না পাওয়া গেলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে কানা হরিদত্তই মনসামঙ্গালের প্রথম রচয়িতা। কানা হরিদত্তই প্রথম মনাসমঙ্গালের মৌখিক কাহিনিকে লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। পরে এই মনসামঙ্গাল কাহিনি নানাভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তুর্কি আক্রমণ-পূর্ব বঙ্গাভূমিতে যে কাহিনি রচার সূত্রপাত (যদি কানা হরিদত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। প্রাপ্ত মঙ্গালকাব্যগুলি অবশ্য তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী) অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই ধারার সজীব

বিস্তার লক্ষ করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই লিখিতরূপ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জনমানসে গড়ে ওঠা কাহিনির রূপায়ণ। সুতরাং লিখিতরূপের সাহায্যে লেখা পূর্ববর্তী সময়ের বৃত্তান্তও স্পর্শ করা যায়। আবার এই কাহিনির মধ্যে তুলনায় অর্বাচীন রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রও যে নিহিত আছে তা একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যাবে।

মনসামঙ্গল কাহিনির তিনটি প্রধান ধারা। একটি পূর্ববঙ্গের কাহিনি (বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এই ধারার অন্যতম কবি) ধারা, একটি রাঢ়বঙ্গের কাহিনি ধারা (বিপ্রদাস এই ধারার অন্যতম কবি, পাঠ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মঙ্গালও এই ধারার) এবং একটি উত্তরবঙ্গের (জগৎজীবন ঘোষাল এই ধারার অন্যতম কবি) ধারা। এই ত্রি-ধারার কাহিনির মধ্যে সমাজ ইতিহাসের সাধারণ উপাদান যেমন আছে, তেমনই আছে বিশিষ্ট উপাদান। আমরা কতগুলি চিহ্নের সাহায্যে সমাজ ইতিহাসের উপাদানগুলিকে বুঝে নিতে পারি।

বোঝাপড়ার সুবিধার জন্য মনসামঙ্গালের সুপরিচিত সাধারণ কাহিনিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থিত করা যেতে পারে—

মনসার জন্ম ⟶ মনসার পূজাপ্রাপ্তির অভিলাষ ⟶ মনসার বিজয় অভিযান

রাখালদের পুজো
↓
হাসান-হোসেন পালা
↓
চাঁদের রাজ্যে বসবাসকারী জেলেদের পুজো
↓
সনকার পুজো
↓
চাঁদের প্রতিকূলতা
↓
ধন্বন্তরি বধ
↓
লখীন্দরের মৃত্যু, বেহুলার ভাসান ও স্বামীর জীবনলাভ
↓
চাঁদের পুজো ⟶ মনসার প্রতিষ্ঠালাভ

মনসামঙ্গাল কাহিনি আদলে দেবী মনসার প্রতিষ্ঠা কাহিনি। দেবী মনসা ক্রমান্বয়ে সমাজের অবতলবর্তী সম্প্রদায়ের কাছে (জেলে, রাখাল, কৃষক) ; ধনী বণিক ও মুসলমান শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে (চাঁদ ও হাসান-হোসেন) প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। উচ্চ শ্রেণির হিন্দুসমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মূলত নারীরাই (সনকা ও বেহুলা)। মনসা মৃতকে প্রাণ দিতে পারেন (লখীন্দর), সম্পদ দিতে পারেন অথবা হৃতসম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারেন (রাখাল ও জেলেদের সম্পদ দিচ্ছেন, চাঁদের হৃতসম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছেন)। এবং প্রয়োজনে প্রতিস্পর্ধী শক্তিকে বধ করতে পারেন (ধন্বন্তরি বধ)। সুতরাং দেবতার জন্মের পেছনে প্রাথমিক ভাবে যে ভীতি ও ভোগেচ্ছা ক্রিয়াশীল থাকে তা এখানে স্পষ্ট। মঙ্গালকাব্য-রচয়িতারা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের

মনসামঙ্গালে 'পূজা প্রচারে নেতর পরমার্শ' অংশে নেত মনসাকে বলেছে 'বিড়ম্বনা বিনে/এ তিন ভুবনে / না পূজিব কোন জনা।' আবার একথাও বলতে ভোলেনি '... তবে মাতা / হবে বরদাতা / যে জন পূজন করে।'

চাঁদের পালার সঙ্গো মিশে আছে বেহুলা লখীন্দর পালা। লক্ষ করলে বোঝা যাবে এই পালাটি চাঁদের পালার থেকে পৃথক। প্রাচীন ধরিত্রী দেবীর হাতে শস্যদেবতার মৃত্যু ও পুনর্জীবনলাভের গল্প প্রচলিত ছিল কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে। বাংলা দেশে কৃষিকাজের সময় বেহুলার ভাসানগীত হত। এর থেকে অনুমান করা যায় বেহুলা লখীন্দর পালার মূলে আছে শস্যদেবতা ও ধরিত্রী দেবীর গল্প। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কোনো পুরুষকে হত্যা করে শস্যকেন্দ্রিক এই রক্তপ্রথাটি (blood wright) পালন করা হত। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো পুরুষঘাতিনী রমণী হয়ে উঠল পতিব্রতী সতী। আমাদের মনে পড়ে যাবে চাঁদ বেহুলাকে লোহার কলাই সেদ্ধ করতে বলেছিল। বেহুলা লোহার কলাই সেদ্ধ করে প্রমাণ করেছিল তার সামর্থ্য। আদতে লোহার কলাই সেদ্ধ করা মানে তো না-অঙ্কুরিত বীজকে অঙ্কুরিত করা। বেহুলা তা পারে। কৃষিব্যবস্থার সঙ্গো বেহুলার যোগোযোগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে এই কাহিনি।

মনসামঙ্গালের হাসান-হোসেন পালাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এর মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সমাজ ইতিহাসের বিশেষ প্রবণতা ক্রিয়াশীল। ইয়ুং (Jung) স্বপ্নের দুটি কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনায়। এই কারণদুটি হল অবদমন ও ইচ্ছাপূরণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আখ্যনকাব্যগুলিতে ইচ্ছাপূরণের কাল্পনিক বিবরণ একটি সাধারণ ঘটনা। হাসান-হোসেন পালায় বিজিত হিন্দুর দেবী মুসলমান শাসকদের যেভাবে আলকুশি ও ভীমরুলের সাহায্যে নাস্তানাবুদ করেন তাতে বিজিত হিন্দুর স্বপ্নপূরণ হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে হোসেনের মায়ের পরিচয়বাহী পয়ারপঙ্ক্তি দুটি হল ঃ

'সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম্মফলে / বিবাহ করিল কাজি ধরি আনি বলে।।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। হাসান-হোসেন পালা যে সমাজ ইতিহাসকে স্পর্শ করে আছে তা বোঝা যায়।

এই কাহিনির মধ্যে ক্রমে সমন্বয়-এষণা যুক্ত হয়। দ্বিজ-বংশীদাসের কাব্য থেকে একটি অংশ উদ্ধার করা যাক :

'তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে উচিত নয় রাখ হিন্দুয়ান॥
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে।
যার তার কর্ম্ম সেই করে ধর্মজ্ঞানে॥
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোনো কার্য নাই।।'

এডোয়ার্ড সি-ডিমক তাঁর 'The Sound of Silent Guns and Other Essays' গ্রন্থে একটি ছিন্ন মনসামঙ্গাল পুথিতে প্রাপ্ত হাসান-হোসেনের বিচিত্র রূপান্তর কাহিনি উল্লেখ করেছেন। এই পুথিতে আছে শিব মুসলমান যুবা হয়ে দুর্গাকে ধর্ষণ করার ফলে হাসান-হোসেনের জন্ম হল। বোঝা যায় হাসন-হোসেন পালায় হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ও মিলনের এক দ্বান্দ্বিক ইতিহাস আভাসিত।

মনে রাখতে হবে মনসামঙ্গালের কাহিনিবৃত্তগুলির মধ্যেই শুধু নয় টুকরো উল্লেখের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাসগত বিন্যাস।

৪.২ কেতকাদাসের মঙ্গালকাব্য

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পাঠ্যাংশের আলোচনার আগে আমরা এই মঙ্গালকাব্যটির ঘটনাগুলিকে কাব্যটির গঠনানুসারে বিন্যস্ত করতে চাই। বোঝার সুবিধের জন্য একটি ছক দেওয়া হল।

গঠনগত সারণি

কেতকাদাসের
মঙ্গাল-কাব্য

দেবখণ্ড

১. বন্দনা (মনসা, গণেশ, সরস্বতী, চৈতন্য, পঞ্চদেবতা, দেবদেবী বন্দনা)
২. শকবর্ণনা
৩. সৃষ্টিপালা
৪. মনসার জন্ম
৫. মনসার সঙ্গো চণ্ডীর দ্বন্দ্ব
৬. মনসার বিবাহ
৭. সর্পভয়ে মনসার পতির পলায়ন
৮. আস্তিকের জন্ম
৯. মনসার পূজা প্রচারের বাসনা

নরখণ্ড

১. রাখালদের মধ্যে পূজা প্রচার
২. হাসান-হোসেন পালা
৩. চাঁদের পালা
- চাঁদের প্রজা জালু-মালুর কাছে পূজা প্রচার
- চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরি বধ
- বেহুলা লখীন্দর বৃত্তান্ত

৪. চাঁদের মনসা পূজা

(পাঠ্য) —
- ক. লখীন্দর বিবাহ প্রস্তাব
- খ. বেহুলার যোগ্যতা বিচার
- গ. বেহুলার-লখীন্দরের বিবাহ
- ঘ. লখীন্দরের বাসরে মৃত্যু
- ঙ. লখীন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য বেহুলার প্রয়াস
- চ. লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভ
- ছ. চাঁদের মনসা পূজা (৪)

এই গঠন-চিত্রটি লক্ষ করলে কেতাকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের আলাদা করে চোখে পড়বে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক।

i) লক্ষণীয় বন্দনা অংশে 'চৈতন্যবন্দনা' রয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় এই মঙ্গালকাব্যটির চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) পরবর্তী-কালের। অক্ষয় কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল' কাব্যে রচনাকাল জ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে। 'শূন্য রস বাণ শশী / শিয়রে মনসা আসি / আদেশিলা রচিতে মঙ্গাল।' এই শ্লোক অনুসারে ১৫৬০ শব্দে অর্থাৎ ১৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে কেতকাদাস কাব্য রচনার আদেশ পান। অর্থাৎ কেতকাদাসের কাব্য সপ্তদশ শতকের রচনা।

ii) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের শকবর্ণন অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশ সমকালীন ইতিহাসের নানা সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' বইতে অনুমান করেছেন কবি কেতকাদাসের কাব্যরচনাকালের সঙ্গো বিষ্ণুদাস ও জরামল্লের সময়ের সমাপতন ঘটেছে। এঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

iii) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনসা চরিত্রে মানবায়ন ঘটেছে যেন। বিমাতা চণ্ডীর দুর্ব্যবহার থেকে শুরু করে সর্পভয়ে স্বামীর পলায়ন পর্যন্ত অংশ পাঠ করলে

একটি মেয়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনি মুখ্য হয়ে ওঠে। তবে মনসা পূজা প্রচারের পদ্ধতিগত কোনো রূপান্তর এই মানবায়নের ফলে সম্ভব হয়নি। মনসার সহচরী নেত মনসাকে পুজো প্রচারের জন্য যে দুটি পরামর্শ দিয়েছে তাতে মঙ্গালকাব্যের দেবীরূপে স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক. না পূজে যে জন কহিবে সপন বসিয়া তার শিয়রে ॥
নর দুরাশয় এ মতি না লয় দেখাইব বিড়ম্বনা।
বিড়ম্বনা বিনে এ তিন ভুবনে না পূজিব কোন জনা ॥

খ. তবে বিশ্বমাতা হবে বরদাতা যে জন স্মরণ করে ॥
ধনপুত্র বর দিবে গো বিস্তর যে জন তোমারে সেবে

কেতকাদাসের কাব্য চৈতন্য-পরবর্তী। তবু কেতকাদাসের কাব্যে কিন্তু চৈতন্য-প্রবর্তিত অহৈতুকী ভক্তির কোনো প্রভাব নেই। ভীতিপ্রদর্শন এবং সম্পদপ্রদানের মাধ্যমে দেবী পূজা আদায় করে। এই ভীতিধর্মের সমালোচনা রয়েছে 'চৈতন্যভাগব'ত-এ। 'চৈতন্যভাগবত'কার চৈতন্যপূর্ববর্তী নবদ্বীপধামের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে মদ্যমাংস লয়ে শক্তিপূজা করার কথা তির্যকভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ভীতিধর্ম বা হেতুধর্মের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেব তাঁর অহৈতুকী প্রেমধর্ম ও নামভক্তিবাদ প্রচার করেন। ভীতিধর্মের দাপট যে এতে কমেনি কেতকাদাসের কাব্য পড়লে তা টের পাওয়া যায়। বরং মনসার পূজাপ্রচারে এই ভীতিপ্রদর্শন ও সম্পদপ্রদানের সূত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। পূজাপ্রচার ঘটনাগুলি লক্ষ করলেই তা টের পাওয়া যাবে। একটি সারণি প্রদান করা হল :

পূজক সম্প্রদায়	পূজার কারণ
রাখালদের মধ্যে পূজা প্রচার	মনসা রাখালদের গোসম্পদ পূরণ করে ও পরে ধনসম্পদ প্রদান করে।
হাসান-হোসেন (মুসলমান)	মনসার দমননীতিতে হাসান-হোসেন ভয় পেয়ে পুজো করে।
জেলে (জালু - মালু)	সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে পূজা প্রচার
চাঁদ সদাগর	চাঁদের পুত্রদের মনসা হত্যা করে ও পরে বেহুলার প্রার্থনায় লখীন্দরসহ মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে দেয়। সম্পদপ্রদান করে।

৪.২.১ মনসামঙ্গালকাব্যের কাহিনি-কাঠামো

মনসামঙ্গালকাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনি-কাঠামো ভৌগোলিক দিক থেকে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত। অবশ্য নরখণ্ডের মধ্যে দেবখণ্ড মিশে যায়। কাহিনি উপকাহিনি সমন্বিত। একটির সঙ্গো অন্যের যোগ শিথিল। শুধু মনসার বিজয়কাঙ্ক্ষাই কাহিনিগুলির যোগসূত্র।

৪.৩ চাঁদ বৃত্তান্ত

আমাদের প্রচলিত পাঠে চাঁদ সদাগরকে আমরা দেবদ্রোহী বলে জানি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কালিদাস রায় তাঁর 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থে 'চাঁদসদাগর' নামক কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'এ বঙ্গের সমতলে তৃণলতা গুল্মদলে বজ্রজয়ী বনস্পতি' যে চন্দ্রধর বীর কবিতাটিতে তার বন্দনা আছে। কবির প্রান্তিক সিদ্ধান্ত : মানুষের কৃপার পরে দেবমহিমা নির্ভর করে। এই বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। মানবতাবোধের (humanism) ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কালিদাস রায় এই কবিতাটি লিখেছিলেন। মনসা অন্যায়ভাবে চাঁদকে দমন করার চেষ্টা করছেন ও চাঁদ মনসার দমননীতি অগ্রাহ্য করছেন এই বৃত্তান্ত খেয়াল রাখলে চাঁদ কাহিনিকে দেবতার অন্যায়ের প্রতি মানুষের চিরন্তন

লড়াই হিসেবে পড়তে ইচ্ছে করে। আশুতোষ ভট্টাচার্যও তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন 'নারায়ণদেবের কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার কাব্যের পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আনুপূর্ব্বিক সামঞ্জস্য রক্ষায় সার্থক হইয়াছে। তিনিই চাঁদ সদাগরকে দিয়া বামহস্তে মুখ না ফিরাইয়া একটি ফুল দিয়া পূজা করাইয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো কবি, এমনকী বিজয় গুপ্তও তাঁহাকে দিয়া ঘটা করিয়া মনসার পূজা করাইয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।'

কালিদাস রায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্ত থেকে চাঁদ চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনে কতগুলি ধারণা দানা বাঁধে।

i) চাঁদ আসলে দেশদ্রোহী, মানবতাবাদী। বাঁ হাতে ফুল দিয়ে শেষ পর্যন্ত পুত্রস্নেহ-পরবশ চাঁদ মনসার পুজো করেছে। মনসাও চাঁদের ওই বাঁ হাতের ফুলেই তুষ্ট।

ii) মনসামঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যেন চাঁদের প্রাধান্যই সূচিত হল।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্য এত সহজ নয়। আমাদের পাঠ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেরই চাঁদ ঘটা করে মনসার পুজো করেছে। এই বিষয়টিকে আমরা কেমন করে বিশ্লেষণ করব ? বস্তুতপক্ষে নারায়ণ দেব ছাড়া আর কারো মনসামঙ্গলকাব্যেই বাঁ হাতে পুষ্পপ্রদানের ঘটনাটি নেই। আবার চাঁদ নারায়ণ দেবের কাব্যেও বাঁ হাতে ফুল দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘটা করে মনসা পুজো করেছে। নারায়ণ দেবের কাবেই আছে—'পূজে সাধু এক মনচিত্তে। / শুন রে মৃদঙ্গের ধ্বনি / শঙ্খ ঘন্টা রাসবেণী / বিবাদী খন্ডিল আজি হোন্তে।' সুতরাং এই পুজো করার বৃত্তান্তটিকে ব্যাখ্যা না করে চাঁদকে দেবদ্রোহী মানবতাবাদী নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

আসলে মনসামঙ্গল কাহিনির মধ্যে শৈব ও শাক্ত সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব নিহিত আছে। বঙ্গভূমিতে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'পদ্মাপুরাণ' ও 'দেবী ভাগবত' মনসার উল্লেখ পাওয়া যাবে। বঙ্গভূমিতে রচিত পুরাণগুলিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিস্তারের প্রক্রিয়া স্পষ্ট। অব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে পুরাণ রচনার কৌশলে ব্রাহ্মণ্য দেবপরিমণ্ডলে স্থান দেওয়া হচ্ছে। এতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দাপট ছড়িয়ে পড়ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সাঙ্গীকৃত দেবতার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণেতর দেবভাবনার বৈশিষ্ট্য মিশে যাচ্ছে। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিবদেবতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর আগেই।

বেদগ্রাহ্য এবং বেদবাহ্য শিবের এই দুই রূপের কথা বলেন তাত্ত্বিকরা। এই দুই মূর্তির মধ্যে সাঙ্গীকরণ ঘটেছিল। বৈদিক রুদ্রদেবতাই কালক্রমে শিবে পরিণত হচ্ছে বেদপন্থীরা একথা বিশ্বাস করেন। রুদ্র দেবতার ক্রিয়াক্ষেত্রটি সুবিস্তৃত। যাস্কের 'নিরুক্ত' অনুযায়ী 'রুদ্র' শব্দ রু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করে বলে রুদ্র। রু এবং দ্রু (গতি) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করতে করতে গমন করে এই অর্থে রুদ্র। ক্রন্দনরত রুদ্রের ক্রন্দনের হেতু হিসেবে নানা পৌরাণিক (দ্র. 'বিষ্ণুপুরাণ', সৌরপুরাণ) কাহিনি প্রচলিত থাকলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না রুদ্র আদতে ঝড় বা ঝড়ের দেবতা। এই বৈদিক ঝড়ের দেবতাটি অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে সমাপতিত হয়েছিল। এছাড়া ক্ষেত্রপতি রুদ্র ('বাজসনে'য় সংহিতা') তস্কর-অধিপতি রুদ্র ('যজুর্বেদ', ১৬/২০ ১৬/২১) দেবতাটির বিচিত্র অধিকারক্ষেত্রের প্রমাণ দেয়। বৈদিক যুগেই রুদ্র শিব নামে অভিহিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ 'নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ/ ময়স্করায় চ মনঃ শিবায় চ শিবতরায় চ' (বাজসনেয়ি সংহিতা, ১৬/৪১)

বেদবাহ্য শিবের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁদের মতে সিন্ধুসভ্যতায় মাতৃকাপুজোর সঙ্গে শিবের পুজোও প্রচলিত ছিল। সেখানে যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বশিশ্ন শৃঙ্গবিশিষ্ট দেবমূর্তির চারপাশে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, মেষ এবং অধোদেশে হরিণ খোদাই করা আছে। এটি পশুপতি মূর্তি। এছাড়া শিব শিবিজনের দেবতা (tribal god) একথাও অনেকে অনুমান করেন। শিবের বেদবাহ্য রূপের ইঙ্গিত আছে মহাভারতের দক্ষযজ্ঞের কাহিনিতে। বঙ্গভূমিতে শিবটিকেও এই দুই ধারায় মিলিয়ে নেওয়া যায়। তা ছাড়াও দেবতাটির মধ্যে স্থানীয় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

বঙ্গভূমির শিবের মধ্যে যে বেদগ্রাহ্য ও বেদবাহ্য দুই রূপ মিশে আছে একটি সারণির মাধ্যমে তা দেখানো যেতে পারে। এখানে লেখরূপগুলির উল্লেখ করা হল। এই লেখরূপগুলি সুপ্রচলিত মৌখিক রূপ প্রসূত।

ক্ষেত্রপতি রুদ্র বাজসনেয়ি সংহিতা (১৬/১৮)	শিবায়ন কাব্যে শিব কৃষিকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।
দক্ষযজ্ঞ (মহাভারত)	দক্ষযজ্ঞের কাহিনি আছে চণ্ডীমঙ্গলে (কবিকঙ্কণ মুকুন্দ) শিবায়ন (রামেশ্বর ভট্টাচার্য) ও অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র) কাব্যে।
পাশুপত সূত্রম্ (৫/৩, ৫/৭) অনুসারে সাধক প্রেতের মতো আচরণ করবেন	বাংলা সাহিত্যের শিব ভস্মময়, শ্মশানচারী

শিবের এই মিশ্রসত্ত্বরূপটি মঙ্গলকাব্যের দেবীদের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বেই সুগঠিত। ফলে মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিব অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত।

মনসামঙ্গালে নীলকণ্ঠ শিবের প্র-প্রতিমা ভেঙে পড়েছে। শিব সেখানে নীলকণ্ঠ নয়। মন্থনজাত বিষপান করে মনসামঙ্গালের শিব মারা গেছে। সেই শিবকে বাঁচিয়েছে মনসা। অর্থাৎ মনসা শিবের থেকেও শক্তিশালী। শিব যদি পৌরাণিক পরিমণ্ডলে স্থান পায় তাহলে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারিণী মনসা পাবে না কেন ?

শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ের এই কৌশলী দ্বন্দ্ব মিলনের ইতিহাসই চাঁদ-মনসার সম্পর্কের বিন্যাসে নিহিত আছে। শৈব চাঁদ মনসার পূজা করলে মনসার ক্ষমতার স্বীকৃতি জুটবে, কাজেই অন্যদের আর মনসাপূজায় আপত্তি থাকার কথা নয়। চাঁদের কিস্যায় এই দৈবপ্রকল্পনা খুব স্পষ্ট।

চাঁদ সদাগরের ঐতিহাসিকতা নিয়ে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতো কেউ কেউ মাথা ঘামিয়েছেন। চাঁদের বাসভূমি চম্পকনগরীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। মনসামঙ্গালকাররা চাঁদের ঐতিহাসিকতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। লোকশ্রুতিতে বণিকজাতির সমৃদ্ধির সময়ে চাঁদের কাহিনি গড়ে ওঠা সম্ভব। মনসামঙ্গালকাহিনি রচনার সময় চাঁদ দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ হয়ে উঠেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে সমুদ্রমন্থনের ফলে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চাঁদ উঠে এসেছে। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ আদতে পশুসখা ঋষি। সর্পদংশনে তার পোষা পাখির মৃত্যু হয়েছে বলে সে মনসাবিরোধী। এছাড়াও মনে রাখতে হবে চন্দ্র নামটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। বিপ্রদাসের কাব্যে আছে ‘মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইহার। / নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার।।’ নাম সাহিত্যেও চন্দ্রশব্দটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। শিবের চন্দ্র অর্থাৎ শিবের বীর্য, নিহিতার্থে সৃষ্টির অমৃত। চাঁদও শিবশিষ্য। বোঝা যায় মনসামঙ্গালের কবিরা চাঁদকে দেবদ্রোহী চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেননি। চাঁদ-মনসা দ্বন্দ্বের দৈব কারণ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এই চাঁদ প্রবল প্রতিকূলতার পর ঘটা করে মনসাপুজো করল। প্রতিকূলতার সূত্রে আমাদের শিশুপাল ও রাবণের কথা মনে পড়বে। ‘ভাগবত’ শিশুপালের দেববিরোধিতাকে বৈররস (প্রতিকূলতার মাধ্যমে ভজনা, শত্রুভাবে ভজনা) দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই সূত্রেই কৃত্তিবাসের রাবণ রামভক্ত। প্রবল প্রতিকূলতার পর চাঁদ যখন মনসাপূজা করে তখন পরোক্ষে দেবী মাহাত্ম্যই সূচিত হয়। প্রবল প্রতিকূল শৈবও দেবীর পূজা করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং সাধারণ মানুষও পূজা করবে।

৪.৩.১ চাঁদ কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

চাঁদের কাহিনির মধ্যে নানাস্তর নিহিত আছে। এই কাহিনিটি মধ্যযুগে যেভাবে আস্বাদন করা হত আধুনিককালে সেভাবে আস্বাদন করা হয় না। শৈব-শাক্ত দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত আধুনিক পাঠে দেবদ্রোহী নায়কের কাহিনি হয়ে উঠেছে।

৪.৪ কেতাকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা

পাতিব্রত্যের মূল্যবোধ ও নারীর অসহায়ত্ব বেহুলা কাহিনির মধ্যে মিশে গেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের নানা অংশ উদ্ধার করে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

i) ঘটকের বেহুলা চরিত্র বর্ণনা : 'গজেন্দ্র-গামিনী রামা : রূপে যিনি তিলোত্তমা : বেহুলা নাচনী তার নাম
বার মাসে বার ব্রত : পুণ্য তিথি করে যত : দেবকার্য্যে করে অবিশ্রাম ।।'

বেহুলার এই বিবরণে বেহুলা ব্রতপরায়ণা রমণী। সমাজসংসার ও পরিবারের প্রতি আনুগত্যের কোনো ত্রুটি তার নেই যেন। এই বেহুলার পারঙ্গমতার নানা পরীক্ষা নেয় চাঁদ।

ii) চাঁদ কর্তৃক বেহুলার পরীক্ষাগ্রহণ—বেহুলার বিবাহলগ্ন স্থির করার প্রসঙ্গে কেতকাদাস লিখেছেন :

'চতুর ঘটক ছিল জনার্দ্দন সাথে। তুলসী আনিঞা দিল দুজনার হাথে ॥
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়। লখীন্দরে কন্যা দিব সায় বান্যা কয় ॥
হেনকালে চাঁদ বান্যা কবে আর কথা। যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন। সেই কন্যা বিভা করে আমার নন্দন ।।'

লক্ষণীয় বেহুলাকে পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। লখীন্দরের কোনো পরীক্ষা অবশ্য বেহুলার পিতা সায় বান্যা নেয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সীতাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে লখীন্দরের প্রাণ নিয়ে স্বর্গ থেকে ফিরে আসার পর সীতার মতো বেহুলাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়।

iii) বেহুলা ও ময়না—নাথ সাহিত্যধারার অন্তর্গত মানিকচন্দ্র রাজা ও রানি ময়নার বৃত্তান্তের সঙ্গে বেহুলা বৃত্তান্তের নানা মিল আছে। দুটি চরিত্রই নারীর অসহায়ত্ব তুলে ধরেছে।

বেহুলা কাহিনীতে বাসরঘরে কাল সর্পেরা একে একে প্রবিষ্ট হয়েছে। কৌশলে সেই সাপেদের হাত থেকে বেহুলা তার স্বামী লখীন্দরকে বাঁচিয়েছে। সেসব কৌশল বড়ো মজার। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য অনুসরণ করা যাক।

a) বঙ্করাজ ফণীর প্রবেশ—মধুর বাচনে ও দুধ দিয়ে বেহুলা তাকে নিবৃত্ত করেছে।
b) কালদণ্ড ফণীর প্রবেশ—বেহুলা সর্পটিকে তার আত্মীয় বলে সম্বোধন করেছে।
c) উদয়কাল সর্পের প্রবেশ—বেহুলা সর্পটিকে দাদা বলে সম্বোধন করেছে।

এই সমস্ত সাপেদের ভুলিয়ে শেষ পর্যন্ত সুবর্ণ সাঁড়াশি দিয়ে বেহুলা হড়পি বন্দী করেছে। অবশ্য এরপর লখীন্দর ক্ষুধার্ত হয়েছে। বাসরে স্বামীর জন্য রান্না করে ক্লান্ত বেহুলা ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই অবসরে সর্প দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হয়েছে।

মানিকচন্দ্র রাজা ও ময়নার কাহিনিতেও নানা কৌশলে ময়না যমদূতের তার স্বামীর কাছে আসতে দেয়নি। কখনও ভালো কথা বলে কখনও অর্থপ্রদান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত মানিকচন্দ্র রাজার প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে। এই তৃষ্ণা নিবারণার্থে ময়না জল আনতে গেছে। সেই অবসরে যমদূত এসে মানিকচন্দ্রের প্রাণ হরণ করেছে।

iv) লখীন্দরের মৃত্যু ও বেহুলার প্রতি দোষারোপ—লখীন্দরের মৃত্যুর পরেই লখীন্দরের পরিজনেরা বেহুলাকে দোষারোপ করেছে। কেতকাদাসের কাব্যে আছে—'চিরণ চিরণ দাঁতী / বিভার মঙ্গার রাতি / বাসরে খাইলে প্রাণনাথ' জাতীয় পঙ্‌ক্তি। বেহুলাকে দোষারোপ করা হচ্ছে, 'খণ্ডকপালিনী' বলে গালিও দেওয়া হচ্ছে। স্বামীর মৃত্যুর জন্য যেন বেহুলাই দায়ী। নারীজীবনের অসহায়ত্ব এখানে প্রকাশিত।

v) বেহুলার প্রতিজ্ঞা—বেহুলা তার জীবনের এই পরিণতিকে মেনে নেয়নি। লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য জলে তার মান্দাস ভাসিয়েছে। বেহুলা তার দাদাকে বলেছে—

'...আমি হই কড়হা রাঁড়ী। কত না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি।।
মা বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে।/ সকল ভাউজ সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে।।
নারিব সহিতে আমি দুরাক্ষর বাণী।'

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা এখানে ভাগ্যের বিরোধিতা করার সাহস দেখিয়েছে।

vi) বেহুলার যাত্রা ও লখীন্দরের জীবনলাভ—বেহুলা এরপর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছে। পথের প্রতিকূলতা কম নয়। কখনও কামুক দুর্জন পুরুষ তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে। কখনও বা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। পরিশেষে যখন সে গৃহে ফিরল তখন কেতকাদাসের কাব্যে চাঁদ বান্যা বলেছে :

'যাহা সনে করি আমি বাদ বিসম্বাদ। তাার শরণ লব এ বড় প্রমাদ।।
চেঙ্গামুড়ি কানি বলি যারে দিলু গালি। কোন্ লাজে তাহারে হইব পুটাঞ্জলি।।
মরণ অধিক লজ্জা মস্তক-মুন্ডন। মনসা পূজিতে মোর নাহি লয় মন।।
যেই হাথে পজিনু সোনার গন্ধেশ্বরী। কেমনে পূজিব তায় জয় বিষহরি।।
সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর। ঘরেচে পাইলুঁ বস্যা চৌদ্দ মধুকর।।
হেন মনসার পূজা নাঞি করি যদি। বিপাকে হারাই পাছে পায়্যা পঞ্চনিধি।।

সুতরাং, 'এতেক ভাবিয়া সাধু হৈল সুমতি।। বিবাদ ঘুচিল...'

এই অংশটিতে বেহুলার ওপর সাবিত্রীর মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়েছে। চাঁদের স্বীকৃতিতে মনসাও দেবী হিসেবে জাতে উঠেছে।

৪.৪.১ বেহুলা কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

বেহুলা কাহিনি প্র- অতীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে গড়ে উঠেছিল। পরে এরমধ্যে নানা উপাদান প্রবিষ্ট হয়েছে। এখন আমরা এটিকে পতিব্রতা রমণীর কাহিনি হিসেবে পাঠ করি।

৪.৫ কেতাকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যমূল্য

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালের কাব্যমূল্যের বিষয়টি আমরা দুভাবে আলোচনা করতে পারি। কোনো কোনো পঙ্ক্তি কবি হিসেবে কেতাদাসের কৃতিত্বের পরিচায়ক। আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গালকাব্যের কবিদের পুচ্ছানুসারী বলেছিলেন। অর্থাৎ চেনাকাহিনির পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। একই কাহিনি লিখলেও কিন্তু কেতকাদাসের কাব্যের কোনো কোনো পঙ্ক্তির চিরন্তন কাব্য-মূল্য আছে। পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ক. 'মড়ামাস জলে ভাসে বিপরীত ঘ্রাণ। কদাচ চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ।। দাহনে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে।।"

'দাহনে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে' পঙ্ক্তিটি epigram-এর উদাহরণ। এই সংহত পঙ্ক্তিটিতে কেতকাদাস প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করেছেন।

খ. 'গহন কানন বনে গমাগম নেই। নিশ্চল গম্ভীর জলে কোলেতে লখাই।।"

এই কাব্য-পঙ্ক্তি দুটির মধ্যে অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহার দেখার মতো। গ-ম-ন-ল ধ্বনির অনুপ্রাস এখানে তারল্য আনেনি। জলপথের ও জলপথ-সংলগ্ন বনভূমির নৈঃশব্দ্য এই অনুপ্রাসের ব্যবহারে ধরা পড়েছে।

গ. ফুলিল শরীর তার বিপরীত গন্ধ। বেহুলা কহিল মোর সুধা মকরন্দ॥

এই পঙ্ক্তি দুটিতেও বেহুলার প্রেমের গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজপ্রভাব-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী ও মৈমনসিংহ গীতিকা প্রণয়গীতিকা হিসেবে পাঠ করা হয়। কেতকাদাসের এই কাব্যপঙ্ক্তিগুলিও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেতকাদাস এই পঙ্ক্তিগুলির মধ্য দিয়ে বেহুলা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন।

কাব্যমূল্য প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। কেতকাদাসের কাব্য পাঠ করলে আমাদের অন্যান্য সাহিত্য-নিদর্শনের কথাও মনে পড়বে।

ক. 'বিষহরি বিনোদিনী মায় কৈল তায়। গাঙ্গাপুরে বেহুলার মান্দাস আল্যায়॥
বাঁশের গজাল যত সব গেল ছাড়্যা। খানি খানি হয়্যা ভাসে যত কলা গড়্যা॥'

এইভাবে বাঁশের গজাল খুলে ভেলা ভেঙে যাওয়ার বৃত্তান্ত 'আরব্যরজনী'র কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানেও চুম্বক পাহাড়েরর টানে লোহার গজাল খুলে জাহাজ ভেঙে যাওয়ার বৃত্তান্ত আছে।

খ. 'বেহুলা কহিল দাদা ন কান্দিহ আর। চাঁপাতলা পুত্যা রাখ মেলানির ভার॥'

'বেহুলা জলযাত্রায় যাওয়ার আগে চাঁপাতলায় খাদ্যদ্রব্য পুঁতে রেখে যাচ্ছে। এই একই মোটিফ (motif) রূপকথার ডালিমকুমারের কাহিনিতে পাওয়া যাবে।

৪.৬ মনসামঙ্গলকাব্যের সাহিত্যমূল্য

মনসামঙ্গাল বা যে-কোনো মঙ্গালকাব্যের সাহিতমূল্য বিচার করতে গেলে কাহিনি ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত—দুয়ের বিচারই করতে হবে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গালকাব্যের কবিদের পুচ্ছানুসারী বললেও সেই সিদ্ধান্ত মান্য করা যায় না।

৪.৬ ইতিহাসের উপাদান

মনসামঙ্গাল অন্তর্গত কাহিনিগুলিতে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্ব গড়ে উঠেছে। সে বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার আমরা পাঠ্যাংশের নানা পঙ্ক্তিতে যে সামাজিক রীতিনীতি সংস্কার নিহিত আছে তার খোঁজ দেব। এই উপাদানগুলি সামাজিক ও লোক-ইতিহাস রচনার কাজে লাগতে পারে।

১) 'বেহুলা নাচনী'—বেহুলার নৃত্যে অনুরক্তি দ্রাবিড় প্রভাবে ফল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। এদিক থেকে মনসামঙ্গালকাব্য বঙ্গাভাষীদের মিশ্রসত্ত্ব চরিত্রের নানা দিক তুলে ধরেছে যেন।

২) 'কন্যাতি বর্যাতি হৈল পথে হুটাহুটি'—বেহুলা লখীন্দরের বাড়ির পরিজনেরা পথে কলহ (হুটাহুটি) করছে। কোনো কোনো কৌমে বল প্রয়োগ করে কন্যাহরণের দৃষ্টান্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই রীতিটিই কৃত্রিম বাধাদানে (Mock fight) পর্যবসিত হয়েছে। এখানে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

৩) 'গমনে গোধিকা ডাকে মস্তক-উপর'—চাঁদ লখীন্দরের জন্য পাত্রী দেখতে যাচ্ছে। যাত্রাপথে গোধিকা ডাকল। এখানে গোধিকার ডাক অমঙ্গাল সূচক। এখানে চাঁদ যে কৌমের মানুষ গোধিকা সেই কৌমের কাছে নিষেধাত্মক প্রতীক (taboo)।

৪) শ্বেতকাককে বেহুলার অনুরোধ—বেহুলা লখীন্দরকে নিয়ে জলে ভেসে যাওয়ার আগে শ্বেতকাককে তার দুর্দশার খবর জানাচ্ছে। শ্বেতকাককে অনুরোধ করেছে তার বাড়িতে খবর দিতে। হিন্দু লোকশ্রুতি অনুযায়ী কাক যমদূত, এখানে অবস্য সংবাদবাহী। পদাবলিতেও কাক সংবাদবাহী। সেখানে আছে—'প্রভাত সময়ে কাক কলকলি / আহার খাটিয়া খায় / প্রিয় আসিবার / নাম শুধাইতে / উড়িয়া বসিল তায়।

'বেহুলা ডোমেনী আমি'—বেহুলা ও লখীন্দর স্বর্গ থেকে ফিরে আসার পর নিজেদের ডোম বলে পরিচয় দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নানা উপাদান পাশাপাশি রয়েছে এটি তার অন্যতম প্রমাণ। কারণ এর পরেই মনসার পূজার যে পদ্ধতিগত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ইঙ্গিতবাহী।

৬) মেঘে হব অল্প জল : বৃক্ষ হরিবেক ফল : ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে হবে ঘর

কেতকাদাসের কাব্যের শেষে রয়েছে কলিযুগ-বর্ণন। কলিযুগ-বর্ণন সংস্কৃত পুরাণেও থাকত। এই কলিযুগে 'ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে হবে ঘর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মিলনকে অনাচার বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ আমরা আগেই দেখেছি মঙ্গলকাব্যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। তাহলে কলিযুগ বর্ণনে বিপরীত কথা কেন বলা হচ্ছে ? বিষয়টি গভীর তাৎপর্যবাহী। আসলে তুর্কি আক্রমণের পর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গভীর সংকট দেখা দিয়েছিল। এই সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্যই কোনো কোনো অব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও দেবদেবরী সংস্কৃতায়ন ঘটানো হল। এর অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য দুয়ের পার্থক্য মুছে গেল। মঙ্গলকাব্য অপৌরাণিক দেবদেবীর পৌরাণিকীকরণ ঘটছে এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি তার দাপট বজায় রাখার জন্যই খানিকটা হলেও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায় কিন্তু তাকে পুরোটা স্বীকার করে না।

৪.৬.১ মনসামঙ্গলকাব্যে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

মনসামঙ্গাল কাব্যে সামাজিক ইতিহাসের নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই উপাদানগুলি বিভিন্ন কৌমের সংস্কৃতির মিল, বেমিল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।

৪.৭ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(i) দুজন মনসামঙ্গাল রচয়িতা কবির নাম লিখুন।

(ii) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য কোন্ সময়ে রচিত ?

(iii) বেহুলার পিতার নাম কী ?

প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অনুসরণে বেহুলা চরিত্রটি বিচার করুন।

২. মনসামঙ্গালকাব্যে ইতিহাসের নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আলোচনা করুন।

৩. কেতকাদাসের কাব্যের সাহিত্যমূল্য বিচার করুন।

৪. মনসামঙ্গাল কাব্যধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালের স্থান নির্ণয় করুন।

৫. মনসামঙ্গাল কাব্যের কাহিনি-নির্মাণ ও গঠন-কৌশলের পরিচয় দিন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. অক্ষয়কুমার কয়াল চিত্রা দেব সম্পাদিত—*কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গাল*

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য—*বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস*

৩. William L. Smith—*the One-eyed Goddess : A Study of the Manasa-Mangal*

৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত—*বিপ্রদাসের মনসাবিজয়*

৫. P.K. Maity–*Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa*

৬. Edward C. Dimock–*The Sound of Silent Guns and Other Essays.*

৭. সুকুমার সেন—*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*